KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200'	Place of Publication : অনুরাগ প্রকাশনী ৩৪/2 মহিম হালদার স্ট্রীট, কল- 26
Collection : KLMLGK	Publisher মিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 3 4 5 6	Year of Publication : আশ্বিন ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫ মে ১৯৯৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
	Condition : Brittle Good ✓
Editor মীরা ভট্টাচার্য	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

অনুরাগ....

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

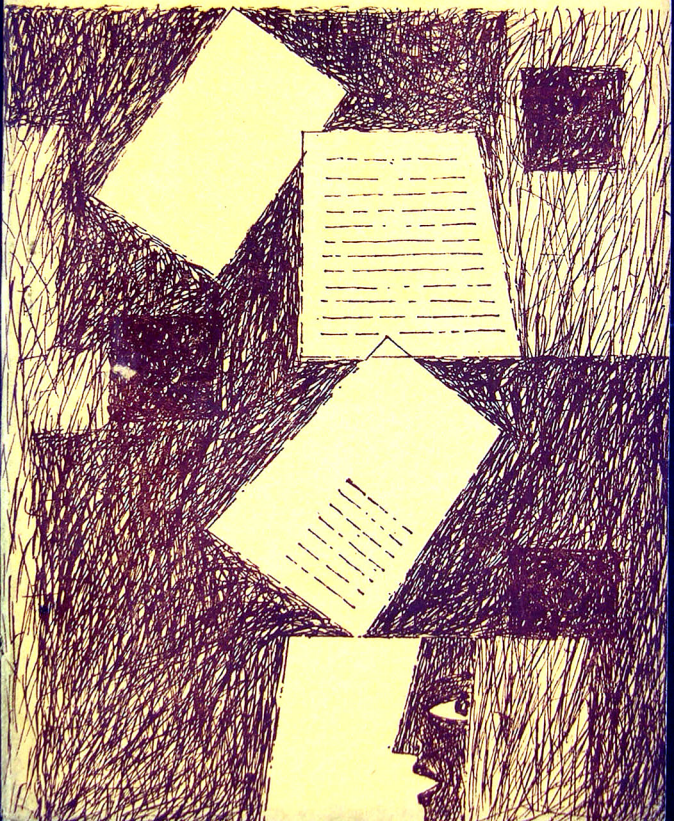

প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক

পৃষ্ঠপোষক শান্তি রায়, দীপালী চৌধুরী, অপরেশ সেন, কমলপানি রায়চৌধুরী

অনুরাগ...

তৃতীয় সংকলন ঃ আশ্বিন ১৪০১ বঙ্গাব্দ

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উপদেষ্টা প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী অর্চিতা রায়চৌধুরী, মীনা বসু, জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার। সাংগঠনিক-প্রধান ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন

৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০২৬

সূচীপত্র

জাতীয় সংহতি ঃ অনুরাগের কথা	৩
মতামত	৪
বাংলা ভাষা ঃ গজেন্দ্রকুমার ঘোষ	৫
বীরভূমি রাজস্থান ঃ জয়ন্তী সান্যাল	৬
এক ভাইবোনের গল্প ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৯
মা, প্লীজ ঃ লায়লী দাশ	১২
দেশান্তর ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯
গোপন প্রেম ঃ ইন্দু রক্ষিত	২৩
গুপ্ত গান ঃ নিশিনাথ সেন	২৩
বাংলা ভাষা ঃ নগেন নিয়োগী	২৪
নিজস্ব লিপিকলা ঃ প্রিয়ব্রত গৌতম	২৪
রুটি ঃ ফজলুর রহমান 'হাশমী'। কালীপদ কোঙার	২৫
আমি ঃ দেবকুমার গুহ	২৫
কেন এ পক্ষপাত ? ঃ হরি ভট্ট	২৬
কোন্ ভাষাতে ঃ মাঈনুল ইসলাম চৌধুরী	২৮
ভয় হয় ঃ রণজিৎ মিত্র	২৯
মুক্তকেশী ঃ ইরা চক্রবর্তী	২৯
শুধু একবার ঃ জয়ন্ত বসু	৩০
ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ	৩১
আনন্দই ভগবান ঃ ধীরা ভট্টাচার্য	৩৪
পুস্তক পরিচয়	৩৬
উদ্ধৃতি	৩৭
সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ	৪০

প্রচ্ছদ ঃ উজ্জ্বল গোস্বামী

সত্য প্রেস ১০/২এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা

জাতীয় সংহতি

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা আমাদের ভাষাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। পৃথিবীর সব মানুষই তাই করে। আমরা বেশি কিছু করি না।

আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক। এখানে আরো অনেক ভাষা আছে। আমরা চাই যেন তাদের চাপে বাংলাভাষার বিকাশে বাধা না ঘটে। দেশের নানা পরিস্থিতির জন্য বাংলাভাষার স্বাভাবিক শ্রীবৃদ্ধি ও চর্চার রাস্তা বহুস্থানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অনেক বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে যেটুকু সমাদর বাংলা ভাষার পাওয়ার কথা ছিল, তা কিছুতেই পাচ্ছে না। বাঙ্গালীমাত্রেরই এ বিষয়ে ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে দেওয়া ঠিক নয়।

দেশের সংহতির অবস্থা খুব খারাপ। এর উপর হিন্দিওয়ালাদের আবদার বন্ধ করতে না পারলে পুরো ভারতেই সর্বনাশ হবে। কেবল হিন্দির জন্য বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় না করে সব ভারতীয় ভাষার উন্নতির জন্যই যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। 'আঞ্চলিক ভাষা' কথাটাও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। এই নামটি সম্পর্কেও আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে যে কোনো একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার নীতিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হচ্ছে—জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তোলা। এসব প্রশ্নে ভাবনা-চিন্তা না করলে অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হতে পারে।

অবশ্য যে কোন ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে 'অনুরাগ'-এর আপত্তি নেই কিন্তু বাংলা ভাষার যেন অনাদর না হয়' এই তার মনোবাঞ্ছা। 'অনুরাগ' সাহিত্য সংকলন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে চায়।

মতামত

অনুরাগ সাহিত্য পত্রিকাটির উদ্দেশ্য মহৎ। গুরু দায়িত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ। পত্রিকাটি ক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে অগ্নিগর্ভ সত্যের তাগিদ অঙ্কুরিত। এই পত্রিকাটির প্রতি বাংলার সুধী-জনের দৃষ্টি আরো আকর্ষিত হোক এটা একান্তভাবে কামনা করি। —সম্পাদক, উত্তরাপথ, সুইডেন।

অনুরাগ পত্রিকাটি আমার বেশ ভাল লেগেছে। এর নানা বিভাগ এবং সম্পাদকীয় বক্তব্য অনুপ্রেরণা জোগায়।

—কমলাক্ষ সরকার, বিরূপাক্ষ নিকেতন, বন্দীপুর, মিলন সংঘ ক্লাব, পোঃ রহেড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা॥

'অনুরাগ' ভাল হয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আপনাদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অনুরাগ আকারে আয়তনে ছোট হলেও এর লেখাগুলো কিন্তু উঁচু মানের। অনুরাগ বাংলা ও বাঙালীর মনের ফসল হয়ে উঠবে। —দিলওয়ার হোসেন, ধানমাণ্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুরাগ পত্রিকায় শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আমি একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ি। অনেকের কবিতাই দেখি কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ববাবুর কবিতা পাই না। আমি শুদ্ধসত্ত্ব-বাবুর কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক।

—প্রতুল রায়, জলপাইগুড়ি।

অনুরাগ পত্রিকায় সুরমণিয়ন্ কৃষ্ণমূর্তি ও কমলপাণি রায়-চৌধুরীর লেখা প্রবন্ধ দুটি রীতিমত চিন্তাকে আলোড়িত করে তোলে। —আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, একচক্রা, বীরভূম।

পয়লা জানুয়ারির 'দেশ' পত্রিকায় ছোট্ট বিজ্ঞাপন দেখে অনুরাগ দ্বিতীয় সংকলন একটি জোগাড় করেছিলাম। নতুনত্ব পেলাম। —সুব্রত মিত্র, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়া দিল্লি।

বাংলা ভাষা

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলা ভাষা একদিন বাংলার বাইরে থেকেও সমৃদ্ধ হয়েছিল। আজ সেই বাংলা ভাষা খোদ পশ্চিমবঙ্গেই কোণঠাসা। বংলার প্রতি বিমাতাসুলভ রাষ্ট্রীয় দায়সারা দায়ীত্ব পালন চলছে। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে বাঙালী হিসাবে, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও তার উৎকর্ষ-সাধন আমাদের কাছে নৈতিক কর্তব্য হওয়া উচিত।

কলকাতা বাংলাভাষী রাজ্যের রাজধানীশহর। কিন্তু ভারতের যে কোন ভাষার ছাপাখানা আছে। ছাপার ব্যবস্থা আছে। অন্য ভাষায় শিক্ষার সুযোগ আছে। দুর্ভাগ্য, বম্বের ত্রৈমাসিক, নাগপুরের বাংলা পত্রিকা, দিল্লির বাংলা ছাপার বিষয় বাঙালীদের ছাপিয়ে নিতে হয় কলকাতা থেকে। সেখানে ছাপাখানা নেই, নেই বাংলা শিক্ষার সরকারি স্কুল। কিন্তু কলকাতায় ভারতের প্রত্যেক ভাষার উৎকর্ষতা লাভের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, সরকারের দাক্ষিণ্য আছে।

বাংলা ভাষাকে তার সমমর্যাদা প্রদানের জন্য বাংলায় এবং বাংলার বাইরে সর্বস্তরে ভাবনা তুলে ধরার সময় এসেছে। যত দেরি হবে ততই ভারতে বাঙালী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হবার দিন এগিয়ে আসবে।

বাঙালীজাতির নবউজ্জীবন এসেছিল বাংলা ভাষার উৎকর্ষ-তার মাধ্যমে। এই ভাষার প্রতি অবহেলা হবে আমাদের অস্তিত্বের বিলুপ্তির কারণ।

উন্নত ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা সরকারি কাজে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে ব্যবহার করা হয়। অথচ আমাদের বাংলা ভাষায় এখনো পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও শিক্ষার উচ্চস্তরে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পায়নি।

সুইডেনে আজ চোদ্দ বছর যাবৎ বাংলা ভাষায় একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা করছি। তার জন্য সুইডিশ সরকারের অনুদান পাচ্ছি। ভারতের অন্য রাজ্যে বাংলা পত্রিকার জন্য এই অনুদান পাবার কথা কেউ ভাবতে পারেন ?

আজ যাঁরা লিট্‌ল ম্যাগাজিন করেন, অজস্র কবিতাপত্র প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সেবা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তুলে ধরতে চান, সেই যুবশক্তির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুচিন্তিত আন্দোলনের প্রয়োজন। এজন্য এগিয়ে আসতে হবে প্রত্যেক বাংলাভাষীকে। নেতৃত্ব দিতে হবে বাংলা সাহিত্য-সেবীদের।

বীরভূমি রাজস্থান জয়ন্তী সান্যাল

চিতোর হচ্ছে—রাণা কুম্ভ, সংগ্রামসিংহ ও রাণী কর্ণাবতী বাপ্পাদিত্যের চিতোর, পদ্মিনী ও মেবার পুরনারীদের চিতোর, প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের চিতোর। পদ্মিনীর জহর ব্রতের সময়, ৫০০০০ লোক সারা মেবার থেকে এসে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

কর্ণেল টড সাহেব বলেছেন, পাঠান আলাউদ্দিন খিলজী ও মালবের বাহাদুর শাহ এত ক্ষতি করতে পারেননি, সম্রাট আকবর চিতোরের সবচাইতে বেশী ক্ষতি করেছেন। সাম্প্রতিক খননে পাওয়া গেছে প্রাসাদের নীচে এক বিরাট হলঘর, পাশ দিয়ে গোমুখীকুণ্ডের দিকে একটি টানেল, রাণী পদ্মিনী চিতোরের মা-বোনেদের নিয়ে এখানে জহর ব্রত করেছিলেন। পদ্মিনী-মহল জলাশয়ের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সে-যুগে জলের ভেতরে বাড়ি তৈরীর প্রয়োজন ছিল। বিদ্যুৎ ছিল না, পাহাড়ে যাবার রেলগাড়ি ছিল না। তাই পয়সা দিয়ে তৈরি হত হাওয়ামহল বা জলমহল।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া বংশের সাধু-মালিক মহম্মদ জৈমি। তাঁর লেখা 'পদুমাবতে' লিখেছেন—

"সরোবর রূপ বিমোহি হিয়ই হিলোর করেই।
পাউ ছুয়ই মকুদাবই এহি মিস লহরই দেই ॥"

এ পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা আছে,—রাজস্থানী ডিংগল ভাষাতেও। পদ্মিনীর কাহিনী "খোমান-রাসে।"

রাজসামুন্দা লেক—রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ লেক, সারা জেলা রাজনগরকে চারশ বছর ধরে জল সরবরাহ করছে। পিছোলা হ্রদের তীরে 'সিটি প্যালেসে' দেশী-বিদেশী পর্যটক সারি বেঁধে আসে। পাশেই জগনিবাস।

হলদিঘাট—দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি সংকীর্ণ স্রোতস্বতী, মেবারের মহিমময়ী বনাস নদী। বাঁদিকে বনাস নদীর বাঁধ, ডানদিকে সমতলটিতে সেলিম তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ছাউনি ফেলেছিলেন। প্রতাপসিংহ ছিলেন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ের ওপরে। গিরিবর্ত্মের মত উঁচু ও সরু জায়গাটি।

মৌবিচক, উদয়পুরে—শ্বেতপাথরে বেদীর উপরে রাণা-প্রতাপের ব্রোঞ্জের মূর্তি ঘোড়ার পিঠে। কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম, গায়ে বর্ম্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ। যেন উদয়পুরকে পাহারা দিচ্ছেন। চেটকের তিনটি পা বেদিতে, একটি পা শূন্যে। সবুজ গাছে জায়গাটি শোভিত। ওখানে, দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়েছিল। আরাবল্লীর গিরিশির। দুদিক থেকে এসে পথের পাশে থমকে দাঁড়িয়েছে। ঘাট' মানে গিরিপথ—আর মাটি একেবারে হলুদ। গিরিপথটি পেরিয়ে আর একটি উপত্যকা।

এই নালাটি পেরোতে গিয়ে চৈতক পড়ে গিয়েছিল। সামনে চৈতকের সমাধি। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে রাণাপ্রতাপের প্রাণরক্ষা করেছিল। ফলে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা পেয়েছিল। শতসহস্র ভারতবাসী এসে চেটকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে

যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। এই হলদীঘাটে মোগল পক্ষের বেশী ক্ষতি হয়েছিল। চারণ-গান শুনে মনে হল চেটকের পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত ও প্রতাপ শত্রুতা ভুলে হাত ধরাধরি করে রয়েছে।

পঁচিশ বছর আকবরের বিরুদ্ধে প্রতাপসিংহের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ মেবারেরর রাজপুতজাতির মনে প্রতিষ্ঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু জাগরণ মোগল সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করেছিল। প্রতাপ না জন্মালে এই প্রেরণার অধিকারী উদয়পুরের রাজসিংহ ও দক্ষিণাত্যে চতুর অগ্রগণ্য মারাঠা বীর শিবাজী জন্মাতেন কিনা সন্দেহ।

কৈলাসপুরী—মহারাণাদের গৃহদেবতা। শ্বেতপাথরে তৈরী। গর্ভমন্দিরে রূপোর পাতে মোড়া রেলিং, কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ, সোণার ছাতা ও কলস থেকে জল পড়ছে শিবের মাথায় কাঁসর ঘণ্টায় পশুপতিনাথের আরতি হয়।

চিতোরেশ্বরী কালিমাতার মন্দির—৭ম ৮ম শতাব্দীতে এটি সূর্য মন্দির ছিল। সুদূর চিতোরে কালীমায়ের মন্দির ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

মীরাবাঈ মন্দির—উড়িষ্যার মন্দিরের মত রেখ-দেউল, নাটমন্দির ও জগমোহনের পেছনে মূলমন্দির। এই মন্দিরেও তিনটি চূড়া আছে। ভক্তমাল-গ্রন্থে আছে কোন রাজা মীরার গান শুনে উপহার দিতে চেয়েছিলেন রত্নহার—মীরা রাজার উপহার রণছোড়জীর গলায় পরিয়ে দেন।

নাথদোয়ারা—শ্রীনাথজী কৃষ্ণের মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে দোকান, বাজার, হোটেল, ধর্মশালায় হাজার হাজার কর্মচারী মন্দিরের ভোগ প্রস্তুতি, ক্ষীরের প্যাড়া, মালপো, ভোগপ্রসাদ ও ফুলের মালা তৈরী করতে ব্যস্ত। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে মূর্তি ভাঙ্গবার ভয়ে মথুরা থেকে শ্রীবল্লভাচার্য বিগ্রহ নিয়ে পথে বেরিয়ে (১৪৯৫) পড়েছিলেন। রাণা রাজসিংহ খবর পেয়ে তাঁদের মন্দির গড়বার জন্য এখানে জায়গা দেন—যাতে বাদশাহের

হাতে বিগ্রহ নষ্ট না হয়। কথানে শ্রীনাথ চাকা বসে যায়। শ্রীকৃষ্ণ দরিদ্রনারায়ণ, মান্দরটি খোলার তৈরী কাঁচা গাঁথুনি। রাজস্থানী ও কাংড়া শিল্পীদের উদ্যোগে রঙে রাসলীলা, কালীয়দমন, বংশীবাদন আঁকা হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে গাছের ডালে ময়ূরেরা শিখীনৃত্য দেখিয়ে বেড়াচ্ছে বাহারী রঙে।

এক ভাইবোনের গল্প

শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

চার্লস্ ল্যাম্ব (১৭৭৫—১৮৩৪) ও মেরি ল্যাম্ব (১৭৬৪—১৮৪৭) ভাই বোন। দিদি ভাইয়ের চেয়ে ১০ বছর ২ মাসের বড়।

চার্লস্ ল্যাম্বের জন্ম লণ্ডনে। তার বাবা জন ল্যাম্ব মিঃ স্যামুয়েল সল্টের অধীনে কেরানির কাজ করতেন। জনের স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ ফিলড্। এই দম্পতির সাতটি সন্তান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি শৈশব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। চার্লস্ ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

ল্যাম্ব পরিবার খুব গরীব ছিল বলে তারা ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেনি। প্রাইমারী পড়া শেষ করে চার্লস্ মিঃ সল্টের অনুগ্রহে ক্রাইস্ট হস্পিটাল নামে একটি স্কুলে ভর্তি হয় সাত বছর বয়সে। সেখানে মাত্র সাত বছর পড়াশুনা করতে পেরেছে। তারপর তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। এই স্কুলে কোলরিজ (১৭৭২—১৮৩৪) তার সহপাঠী ছিলেন। ল্যাম্ব ভাল ল্যাটিন জানতেন কিন্তু পারিবারিক অভাব ও কথাবলার তোতলামির জন্যে তিনি উচ্চশিক্ষা নিতে পারেন নি।

বত্রিশ বছর বয়সে মেরি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে খাবার টেবিলের ছুরি দিয়ে মাকে খুন করে বসে। তখন মেরিকে ইস্লিংটনের মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। চার্লস্ তার পিতাকে নিয়ে পাশের বাড়ির লজিংয়ে চলে যান।

মেরি পাগলা গারদ থেকে ছুটি পেলে ভাইয়ের অভিভাবকত্বেই থাকতে লাগলেন।

চার্লসের চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পরে ভাইবোনে মিলে লজিংয়ে থাকতে লাগলেন। সেই থেকে ভাই-বোন একসঙ্গেই থাকতেন। চার্লস্ তাঁর দিদিকে যত্ন করতে কসুর করেন নি। দিদি সারাজীবনই ম্যানিয়াতে ভুগতেন।

চার্লস্ একটি কেরানির কাজে ঢুকেছিলেন। পরে ১৭ বছর বয়সে ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি হল। সারা কর্মজীবন তিনি সেখানেই কাটান। পঞ্চাশ বছর বয়সে পেনশন নিয়ে রিটায়ার করেন। তারপর থেকে লেখালেখিতে বিশেষ মনোযোগ দেন। জীবনের বাকি দশ বছর তিনি লিখেই কাটান। ২৭ বছর বয়সেই তিনি প্রাবন্ধিক হিসাবে কিছু নাম করে ফেলেন। ৩২ বছর বয়সে ভাইবোনে মিলে ছোটদের মত করে শেকস্পীয়রের নাটকগুলোর কাহিনী লিখেছেন। এর দু-বছর আগে উইলিয়াম গডউইন চার্লসকে এই কাজের দায়িত্ব দেন। মিলনান্তক কাহিনীগুলো লিখেছেন দিদি, আর বিয়োগান্তকগুলো চার্লসের লেখা। ফলে বেশির ভাগ কাজটা দিদিকেই করতে হয়েছে।

তাঁর বন্ধু কোলরিজ ও তিনি ছ' মাস আগে-পরে মারা যান। ভাইয়ের মৃত্যুর পর দিদি একেবারেই উন্মাদ হয়ে যায়।

কোলরিজ ছাড়াও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (১৭৭০—১৮৫০), রবার্ট সাউদি (১৭৭৪—১৮৪৩) এবং হেজলিটের (১৭৭৮—১৮৩০) সঙ্গে চার্লসের পত্রালাপ ছিল। কোলরিজ আর সাউদি ছিলেন ভায়রাভাই। কোলরিজকে চার্লস সারাজীবনে বহু চিঠি লিখেছেন। চার্লসের বড় কাজই হল শেকস্পীয়রের (১৫৬৪—১৬১৬) নাটকের গল্প কিশোরদের উপযোগী করে লেখা।

চার্লস্ ও মেরি ল্যাম্ব কৃত কিশোরদের উপযোগী 'টেলস্ ফ্রম শেক্সপীয়র' বইটি সারা পৃথিবীতেই এখন অতি জনপ্রিয়

একটি গল্পের সংকলন। কুড়ি বছর আগে থেকে ভারতের জন্য 'রূপা এণ্ড কোং' ছেপে বিক্রি করছে। এখন তার দাম কুড়ি টাকা।

ভাইবোনের কাজ হিসেবে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল। এইভাবে এই ভাইবোনেরা সারা দুনিয়াতে পরিচিত হয়ে রইলেন। দিদি লিখেছেন তেরটি মিলনের গল্প, আর ভাই লিখেছেন সাতটি দুঃখের গল্প। এই কুড়িটি গল্প দিয়েই সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ধ্রুপদী সাহিত্যকে 'সহজ সরল গদ্যে' পরিবেশনের এই রীতি প্রায় দুশো বছর আগে শুরু হয়ে আজও সমান জনপ্রিয়তায় তা এগিয়ে চলেছে।

আজও সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় নানা দেশের ধ্রুপদী সাহিত্য 'সহজ সরল গদ্যে' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। চার্লস ল্যাম্ব এবং মেরি ল্যাম্বই এই পথের প্রথম দিশারী।

এখন বাংলা ভাষাতেও এই 'সহজ সরল গদ্যে' রূপান্তরের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সংস্কৃত থেকে এবং প্রাচীন বাংলা পয়ার, লাচারি, ত্রিপদী থেকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সহজ সরল গদ্যে ধ্রুপদী গ্রন্থাদি রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রতি বছর যে পাঁচলক্ষ করে ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সেই অগণিত পড়ুয়াদের জন্য স্বদেশের ঐতিহ্য জানবার পক্ষে এ এক অতি সুযোগ বলে গণ্য হতে পারে।

দুশো বছর আগে ভাইবোনের শুরু করা কাজ সাগর পার থেকে এখন দেশে-দেশান্তরে এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে বিস্তারিত হচ্ছে।

৺শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মী বস্ত্রালয়

১০০/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
(বসুশ্রী সিনেমার পাশে)

অর্ধ শতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা।

মা, প্লীজ

লায়লী দাশ

কাল ওরা চলে গেল। সঞ্জয় আর ঊর্মি। সুজাতার ছেলে আর তার বৌ। মাত্র দু-বছর হয় বিয়ে হয়েছে ওদের। এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দুজনেই। অনেক চেষ্টা করেও ঊর্মির পছন্দ আর রুচির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন নি সুজাতা। খুব ভোরে ওঠা চিরদিনের অভ্যেস। দাঁত না মেজে কোনদিন কিছু খেতে পারেন না। তাই বেড-টি তাঁর চলে না। বেড-টি না হলে ঘুমই ভাঙে না ঊর্মির। বাড়িতে সব সময় অতিথি অভ্যাগতের ভিড় লেগেই থাকে। তারা সুজাতার শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব। সবাই শিক্ষিত মার্জিত নয়। সুজাতা ভালবাসেন বলেই তারা আসে। তারাও ভালবাসে সুজাতাকে। দিনরাত এত মানুষ, এত কথা সহ্য হয় করতে পারেনা ঊর্মি। শাশুড়ির মত সব রকম মানুষের জন্য তার মন উন্মুক্ত হতে শেখেনি। একটা নির্দিষ্ট সোসাইটি তারও আছে। বন্ধুবান্ধব আছে। তারা ফোনে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসে, ড্রইংরুমে বসে, ফিসফিস করে কথা বলে, গুণগুণ করে গান গায়, আলোচনা আর সমালোচনাও করে নিচু গলায়। সুজাতার বোন বিনীতার গলাটি বড্ড রুক্ষ। পাশের ঘর থেকে, শুনিয়ে শুনিয়ে ক্যাট ক্যাট করে বলেন,—কীরে বড়দি, তোর ছেলের বৌ বুঝি বাড়ি নেই? একবারওতো দেখলাম না? সেই কখন এসেছি।

বাধ্য হয়েই উঠে আসতে হয়। সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলতে হয়,—মাসি, কেমন আছ? অসহ্য লাগে। অন্য বাড়ির, অন্য পরিবারের মেয়ে ঊর্মি, এ বাড়ির অনেক কিছুই ওর পদন্দ হবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। এরজন্য সুজাতার মনে কোন অভিযোগ ছিল না। প্রথম প্রথম এমন সমস্যায় কি তিনি নিজেও পড়েন নি?

বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে ছিলেন, একমাত্র সন্তান। শ্বশুর বাড়িতে স্বামীরা পাঁচ ভাইবোন ও শ্বশুর শাশুড়ি,, বিধবা পিস-শাশুড়ি, অবিবাহিত খুড়ো শ্বশুর। এক একজন এক এক রকম। তখন, তাঁরও অসহ্যই লাগত। মাসখানেক পর, মায়ের কাছে দু-একটা অভিযোগ প্রকাশ করতেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সব সময় মনে রাখবি ওটা তোর শ্বশুর বাড়ি। বাপের বাড়ির সাথে তুলনা করলে পদে পদে দুঃখই পেতে হবে। ওদের সাথে মানিয়ে নিতে নিতেই দেখবি, একদিন নিজের মনের করে গড়েও তুলতে পেরেছিস সবকিছু। একটু সময় আর ধৈর্য চাই। শুধু মন্দটা না দেখে ভালও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করিস। ভালমন্দ মিশিয়েই তো সংসার মা। সেই ভালটা খুঁজতে খুঁজতে কুড়িটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন সুজাতা। অনেক অভাব অভিযোগের ভেতর, সুখ খুঁজে নিয়েছেন, তৈরি করে নিয়েছেন। ছেলে বড় হয়ে, চাকরি করার পরে নিজের আলাদা সংসার গুছিয়ে নেওয়ার পর দেওর ননদদের সঙ্গে ভালবাসার টান আজও অটুট রয়েছে। ঊর্মির সমস্যাটা বোঝেন সুজাতা। তার অস্থিরতা দেখে মনে মনে হাসেনও। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, বিশ্বাস করেন। কিন্তু সঞ্জয়? সাতাশ বছরের অভ্যস্ত জীবনে হঠাৎ এমন বিতৃষ্ণা কেন তার? এ রহস্য ভেদ করতে পারেন না। নিজের ছেলেকে, অপরিচিত আগন্তুক মনে হয়।

বিধবা ময়ের একমাত্র সন্তান, সঞ্জয়। পাঁচ বছর বয়সে হঠাৎ এ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছেন বাবা। নামকরণের ভেতর দিয়েই সুজাতা নিজের জীবনে ছেলের ভূমিকাটা সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। মনের মত করে তিলে তিলে গড়ে তুলতে কোন বাধা পাননি। শ্বশুর, শাশুড়ি দেওরেরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। নিপুণ হাতে নিখুঁত করে তৈরি করেছিলেন। সকলে বলত রত্নগর্ভা। কৃতি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বাবার

মুখটা সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন সুজাতা। মস্ত চাকরি পেল সঞ্চয়, প্রথম সারির অফিসার। শ্বশুর শাশুড়ি মারা যেতে, নিজের ভাগের দুখানা ঘর নিয়ে আলাদা সংসার পাতলেন। জীবনে, কোনদিন কারও কাছে কিছু চাননি সুজাতা। এই প্রথমবার দেওরদের কাছে আবদার করেছিলেন, (তাঁর) ঘরের লাগোয়া একফালি উঠোন, তাঁর ভাগেই থাকুক। দুই দেওরেরই তো একটি করে মেয়ে, বংশের মধ্যে একমাত্র ছেলে তার সঞ্চয়। তার ভিটেয়ই তো ভবিষ্যত বংশধরেরা জন্ম নেবে। সানন্দে সবাই রাজী হয়েছিল। বেল আর রজনীগন্ধার সাথে জবা আর টগর পুঁতে ছোট্ট একটা বাগান করেছিলেন সেই উঠোনে। ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে ঊর্মিলার সাথে পরিচয়। ছেলের চোখের মুগ্ধতা মাকেও স্পর্শ করল। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে ছেলের বৌ ঘরে তুললেন সুজাতা! প্রথম থেকে এ সংসারের ওপর ঊর্মির বিরুপতা তাকে আহত করলেও হাল ছাড়েন নি। অন্য জায়গা থেকে উপড়ে এনে নিজের মাটিতে লাগালে, রস টেনে নিতে সময় তো নেবেই, একটা চারাগাছ। বাড়তি আহার আর যত্ন চাই। ঊর্মির কোন স্বাধীনতায় কোন ভাবেই বাধা দেননা সুজাতা। সব সময় ওর মেজাজ বুঝে, চলতে চেষ্টা করেন। ওর পছন্দ মত কথা বলেন, মনের মত খাবার তৈরি করে খাওয়ান। মাঝে মাঝে বোনেরা বা ননদেরা বৌয়ের ব্যবহারে কটাক্ষ করলে তাদের ওপর বিরক্ত হন, বানিয়ে বানিয়ে প্রশংসা করেন ঊর্মির। তবুও শেষ রক্ষা হলনা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে সঞ্চয় এসে, সামনে দাঁড়াল—অনেকদিন ধরেই একটা কথা বলব ভাবছি।

—কী কথা?

—এই বাড়িটা বড্ড ছোট, দুখানা মাত্র ঘর। বন্ধু-বান্ধবেরা এলে ভাল করে বসান যায় না।

—ঠিকই বলেছিস। আমিও ভাবছিলাম এবার তোদের

শোবার ঘরের লাগোয়া ওই উঠোনের পাশে একখানা ঘর তুলতে হবে। তোর বাবার জমান টাকার একটা অংশ তো ফিক্সড্ করা আছে। ওটা তুলে ফেলব।

—সে অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে, আমি ভাবছি অফিস থেকে ফ্লাটের ব্যবস্থা হচ্ছে, ওমাস থেকে আমরা ওখানেই চলে যাই। 'আমরা' মান সুজাতা ভাবলেন, তারা তিনজন। মা ছেলে আর ছেলের বৌ।

বললেন,—নিজের বাড়ি থাকতে অফিসের ফ্লাটের কী দরকার? এখানে এতদিন আছি। এই তিরিশ বছর। তোর কাকুরা পাশাপাশি আছে। বিপদে-আপদে আত্মীয়-স্বজন, সবাই দেখে। ছেড়ে যেতে মন চায়না রে।

—তুমি যে এখান থেকে যেতে চাইবে না, আমি জানতাম। এই বয়সে, এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। তাই তোমার কথা আমি ভাবিনি। আমাদের কথা মানে আমার ঊর্মির কথাই বলছিলাম। হঠাৎ চারদিক কেমন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চাইলেন সুজাতা। শরতের পরিষ্কার নীল আকাশ। এক ফোঁটাও মেঘ নেই। নাকটা কেন বন্ধ হয়ে আসছে। সর্দি হয়েছে বোধহয়। মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নিতে নিতে ফিস ফিস করে শুধু উচ্চারণ করতে পারলেন—ও।

—জানো মা, ঊর্মির খুব শখ হয়েছে নিজের সংসার সাজিয়ে বসবে। সঞ্চয় আর ঊর্মি। তাদের নিজের সংসার সুজাতা থাকলেই সেটা আর ঊর্মির নিজের সংসার হয়না। এভাবে কোনদিন ভেবে দেখেন নি সুজাতা।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অপ্রতিভ হয়ে যায় সঞ্চয়। অপ্রস্তুত নরম সুরে আস্তে আস্তে ডাকে—মা। ছেলের মুখের দিকে তাকান, সুজাতা।

—তুমি রাগ করলে?

—নাঃ রাগ করব কেন? বিকৃত হাসিতে মুখ ভরে গেল।

—শোন, বুঝতেই তো পারছ ঊর্মি এখানে কিছুতেই এ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। সবসময় কারণে-অকারণে ঠোকা-ঠুকি করার চেয়ে, এই ভাল। সম্পর্কটা ভাল থাকবে।

ছেলের গলায় পরামর্শের সুর। আবার হাসি পায় সুজাতার। 'সম্পর্ক' ভাল রাখার জন্যই ছেলে বৌ তাঁকে ত্যাগ করে দূরে সরে যাচ্ছে।

—ফ্লাটটা বেশী দূরেও নয়, এই গড়িয়াহাটের কাছে।

যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট। এইটুকু দূরত্বেই যদি ছেলে বৌ শান্তিতে থাকে, তিনি বাধা দেবেন কেন? স্থির হয়ে শুনতে থাকেন সুজাতা।

—ভাবনার কিছু নেই। রান্নার মাসি তোমার কাছেই থাকুক। আমরা অন্য একজন যোগাড় করে নিতে পারব। এই ফোনটাও এখানেই থাক, কোন দরকার বা অসুখ-বিসুখ করলে, খবর দিতে পারবে। আমি তো শিগ্গিরই অফিস থেকে ফোন পাচ্ছি। এটা তো তোমার নামেই নেওয়া আছে।

কেমন সুন্দর করে সব গুছিয়ে বলছে সঞ্চু। খাটের ওপর বসে, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলছেন সুজাতা, বাতাসে অক্সিজেনের বড় অভাব। উঠোনের ওই পাশটায়, একটা বটগাছ লাগাবেন, ভাবছেন। মনে মনে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা আঁকতে থাকেন। এককালে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন সুজাতা। সঞ্চয় কখন চলে গেছে টেরও পাননি। নতুন ফ্লাট থেকে তার কাছে যখন বেড়াতে আসবে, আগের মতই 'মা' বলে ডেকে উঠবে সঞ্চু। তিনি বাথরুমে বা ঠাকুর ঘরে থাকলে, হাঁক ছাড়বে—মা? মা কোথায় গেল কমলা মাসি? মা, মাগো।—বুকটা ভরে উঠবে আবার। সপ্তাহে একবার, নাকি মাসে একবার। বৌও বুঝি সাথে আসবে। মিষ্টিসুরে সেও বলবে,—কেমন আছ মা? খাওয়াদাওয়া ঠিকমত করছ তো?

ওষুধপত্র? কমলা মাসি, মায়ের চেহারাটা কিন্তু একটুও ভাল দেখছি না, একটু নজর দিও। এইসব ভাষা তাঁর অপরিচিত নয়। ভাইপো, ভাইঝিদের, দেওরঝিদের মুখে এসব কথা কতবার শুনেছেন।

সম্পর্কটাকে সুন্দর করার জন্য দূরে চলে যাবে সঞ্চু। কিন্তু এই বয়সেও যে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জ্বর হয় তার। কোন কারণে জ্বর হলেই হু-হু করে বেড়ে যায়, একশো চার, একশো পাঁচ। ওষুধ খেয়ে সেই জ্বর যখন কমতে শুরু করে সেও ভয়ংকর ব্যাপার। ঘামতে ঘামতে গা-হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, গায়ের তাপ নেবে পচানব্বুইতে পেঁছায়। তখন পায়ের তলায় হটওয়াটার ব্যাগ দিতে হয়, গ্লুকোজ খাওয়াতে হয়। তাই সঞ্চয়ের জ্বর হলেই সারারাত জেগে বসে থাকেন সুজাতা। এবার থেকে তার জ্বর আসার আশঙ্কায় কোন রাতেই যে চোখে ঘুম আসবে না। সে কথা একবারও ভেবে দেখল না সঞ্চু? মায়ের অসুখ-বিসুখে ফোন করে খবর দেবে বলে ফোনটা এখানেই থাক বলেছে। কিন্তু এই গত বছরই তো, সারারাত এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথায় ছটফট করতে করতে ভোরের দিকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সুজাতা। কমলা 'চা' খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে, জানতে পেরে চিৎকার করে, সকলকে জাগিয়েছিল। সে কথাও এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে?

যাওয়ার সময় হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল ঊর্মি। পায়ে হাত দিল।—আমরা যাচ্ছি।

—'যাচ্ছি' বলতে নেই, এসো।—মন খারাপ করবে না। ভাল হয়ে থেকো। কোন কিছুর দরকার হলেই আমাকে ফোন করে দেবে, বুঝলে?

—আচ্ছা।

—বাঃ এই তো গুড গার্ল।

হি হি করে হেসে উঠেছিল ঊর্মি: বড় নির্লজ্জ, অশ্লীল মনে হয়েছিল সুজাতার।

যেমন যেমন ভেবেছিলেন সেই ভাবেই কেটে গেল চারটি বছর। একমাত্র সঞ্চয়টুকু বিলিয়ে দিয়ে, নিঃসঙ্গ জীবনে নিশ্চিন্ত স্বাধীন হয়ে গেছেন সুজাতা। ঊর্মির কোলে ফুটফুটে মেয়ে এসেছে। গলার হার দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছেন। সেও তো দু-বছর হয়ে গেল। সুন্দরী, স্মার্ট আয়ার কাছে মানুষ হচ্ছে ঊর্মির মেয়ে, তাঁর নাতনী। ঊর্মি নাকি দারুণ একটা চাকরি বাগিয়েছে। এই ভাষাতেই শাশুড়ির কাছে খবরটা দিয়েছিল গত সপ্তাহে। আজকাল ঘন ঘন আসতে পারে না। পনেরো দিনে একবার করে আসে সঞ্চু। ঊর্মি এক মাসে দু-মাসে। আজই আবার মেয়ে কোলে ঊর্মিকে দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। সঞ্চয়ও সাথে আছে। অনেকদিন পর পুরনো সুর শোনা গেল ছেলের গলায় আবদারের সুর,—মা মাগো। বুকটা ভরে উঠেছে।

—একটা কথা বলব? রাখবে তো?

—বল না আগে শুনি। হেসে ফেললেন। মনে পড়ে গেল সাত বছরের সঞ্চু একদিন এমনি করেই একটা কথা বলতে চেয়েছিল। এই উত্তরই দিয়েছিলেন তিনি। একটা টিনটিনের বই কিনে দেবে? টিনটিনের বই? বড় দাম। তবুও 'না' বলতে পারেন নি। কোনদিন আবদার করে কিছু চায় না ছেলেটা।—দেব, কথা দিয়েছিলেন। শাড়িতে ফল্‌স্‌ লাগিয়ে বাড়তি কিছু রোজগার করতেন। বইয়ের টাকা যোগাড় করতে কয়েকদিন সারারাত জেগে জেগে অনেকগুলি ফল্‌স্‌ লাগাতে হয়েছিল। আজ আবার মায়ের কাছে কী আবদার করবে সঞ্চু, কীসের অভাব তার?

—মা, এখন থেকে তুমি আমার ফ্লাটে থাকবে। একা একা এভাবে থাকতে তোমার কষ্ট হয়। বুকটা মুচড়ে উঠল। চার বছর পর এ কথা কেন বলছে খোকা? মা'য়ের অভাব কি এতদিনে বুঝতে পেরেছে সঞ্চু?

—একজন মাইনে করা আয়ার কাছে তোমার নাতনীকে রেখে

চাকরি করতে যাবে ঊর্মি? তোমার মত ভালবেসে দরদ দিয়ে সে কি ওকে মানুষ করে তুলতে পারবে, বল?

—মা, প্লীজ তুমি রাজী হয়ে যাও। ঊর্মির গলায় মধু ঝরে পড়ে।

—না খোকা, নিজস্ব একটা ছেলেই তো আমাকে দিয়েছিলেন ভগবান। তাকেই মানুষ করে তুলতে পারিনি। পরের মেয়ের দায়িত্ব আর এ বয়সে নেওয়া সম্ভব নয়, বাবা। বুকের মধ্যে উথলে ওঠা ঢেউগুলোকে দাঁতে দাঁত চেপে উজানে ফিরিয়ে নিলেন সুজাতা।

দেশান্তর

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইদানিং কমলাকান্ত শর্মা নগ্নপদে চলাচল করেন না। পরেন ক্যাম্বিশের জুতা। স্বল্প দূরত্বে বাসই পছন্দ করেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফাঁকা বাসে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি এক ডেলা আফিমে মৌতাত জমে না বলিয়া দুই ডেলা করিয়া খাওয়া শুরু করিয়াছেন। বাসে একটি ছোট শক্তির অনুজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া যাওয়ায় কমলাকান্তের তন্দ্রামত আসিয়াছিল। হঠাৎ কমলাকান্তের পায়ের নীচে হইতে আওয়াজ আসিল—মেঁয়াও, কমলাকান্তের চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'বাসেত জানিতাম যাত্রী ওঠে, বিড়ালও উঠে নাকি? কি জানি। দিকে দিকে যত ধারণার পরিবর্তন ঘটিতেছে। কবে শুনিব চন্দ্র-পৃষ্ঠেও মানবের পা পড়িয়াছে। যাইহোক তিনি খুশ মেজাজে গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া উঠিলেন, তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ?'

বিড়াল কমলাকান্তের পায়ের তলা হইতে উত্তর করিল, তোমার কি ভীমরতি হইয়াছে দাদাঠাকুর? আমি বাড়ির বৌ

হতে যাব কেন? আমি ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর পোষা বিড়াল। কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে। তোমার গোঁফ দেখিয়া তোমায় চেনা উচিত ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তিও বাড়িতেছে। তুমি ত আমার শত্রুপক্ষ। প্রসন্ন বেটি আমার জন্য যতটা দুধ রাখিত তুমি প্রত্যহ তাতে ভাগ বসাইতে। এখন বল, এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছ? আমার জুতো চুরি করিতে তোমার সাধ হইয়াছে? নাও, তোমাকে একপাটি ক্যাম্বিশের জুতা দান করিলাম। বিড়াল কহিল, 'ঠাকুর আবেগ-উত্তেজনা দমন করো।' ইহা ব্রাহ্মণের কাজ নয়। তুমি আমাকে দুধ-চোর, মাছ-চোর বলতে পার। কিন্তু জুতা-চোর নয়। তাও দুধ-চোর হইয়াছি জীবধর্ম বশে। লোভের বশে নয়। কমলাকান্ত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, অপরাধ নিওনা হে মার্জার। তুমি যে সমাজতান্ত্রিক চোর তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমিই না বলিয়াছিলে, চোর চুরি করিয়া যত না অপরাধ করে, কৃপণ ধনী ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী অপরাধ করে। হে মার্জ্জার, তুমি যুগ যুগ জীও, এখন তোমাদেরই দিন পড়িয়াছে।'

বিড়াল কহিল, উদ্ধৃতিটি ঠিকমত দিতে পার নাই। ইহা তোমার দোষ নয়। বয়সকালে এরূপ হয়। এখন যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম তাহা বলি। আমি তোমার শত্রু নয়, শরণাগত।

কমলাকান্ত চমকিয়া বলিল, বল কি! কমলাকান্ত অপেক্ষা অক্ষম কেহ আছে যে কমলাকান্তের শরণ লইবে! খুলিয়া বল ব্যাপার কি। নচেৎ আমি তোমায় গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া দিব। 'বিড়াল কহিল', ঠাকুর সব খুলিয়া বলিতেছি, ধৈর্য ধরিয়া শুন। দিনকাল বড় খারাপ পড়িয়াছে, ঠাকুর।

কমলাকান্ত কহিলেন, এ কথা সত্য, দিনকাল খুবই খারাপ হইয়াছে। কিন্তু প্রসন্ন গোয়ালিনী কি তোমার ভরণ-পোষণ করে না?

বিড়াল বলিল—প্রসন্নর দিনকাল গিয়াছে। তাহার দেশী গাইগুলি দুধ দেয় না। গ্রামের মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালারা মহিষের খাটাল খুলিয়াছে। তাহারা মহিষকে ইঞ্জেকশন্ মারিয়া ঘড়া ঘড়া দুধ বাহির করিতেছে। তাছাড়া গ্রামের মধ্যে মাদার ডেয়ারীর বুথ হইয়াছে। কার্যত দুধ ও মধুর বন্যা বহিতেছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে এক ফোঁটাও জোটে না। কেন গৃহস্থ কি শিকায় তুলিয়া রাখে? কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিড়াল কহিল—'শিকায় তুলিয়া রাখিলে ত ভালই ছিল। তাহা হইতে সরাইবার পদ্ধতি রপ্ত করিয়াছি। কিন্তু বিশ্বাস করবে না ঠাকুর গৃহস্থ আজকাল তাহাদের দুধ ও মাছ একটি ঠাণ্ডা বাক্সের ভিতর ঢুকাইয়া রাখে। যাহা হইতে সরান ঈশ্বরের অসাধ্য! পিঁপড়াও ঢুকিতে পারে না। খাদ্য ব্যতিরেকে কতদিন জীবন রাখা যায় বল?

কমলাকান্ত বিমর্ষ হইয়া কহিলেন—তোমার প্রতি আমার সমবেদনা রহিল। কিন্তু কালের ধর্মই এরূপ। কে রোধ করিবে বল। আমারও অনুরূপ দশা হইয়াছে। মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই। গো-ব্রাহ্মণের হিতের কথা কেহ চিন্তা করে না। পূজা-অর্চনার পাট উঠিয়া গিয়াছে। তুমিত জান আমি শাকাহারী। উদরান্নের জন্য বিশেষ চিন্তা করি না। কিন্তু নেশার জন্য আফিম ও অনুপান হিসাবে দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন (অভাবে গুড়) অবশ্যই প্রয়োজন। সেগুলি সংগ্রহ করিতেই আমার কালঘাম ছুটিতেছে।

বিড়াল বলিল—'এমতাবস্থায় ঠিক পথ কি ঠাকুর? কমলাকান্ত বলিলেন—'এমতাবস্থায় দুইটি পন্থা আছে—স্বেচ্ছামৃত্যু অথবা দেশান্তর। স্বেচ্ছামৃত্যু যখন লইতে অক্ষম তখন দেশান্তরে যাওয়াই শ্রেয়।' বিড়াল বলিল—'এ কথা গ্রাম হইতে গোপনে শুনিয়াই তোমার পশ্চাৎধাবন করিয়াছি। কিছু মনে কোরো না ঠাকুর। এই জন্যই বলিতেছিলাম আমি তোমার শত্রু নই, বন্ধু।

কমলাকান্ত বলিলেন, যথার্থ বলিয়াছ। সমান বিপদ আমাদের শত্রু হইতে বন্ধু করিয়াছে। এখন কোথায় যাইবে বল?

বিড়াল কহিল—এমন স্থানে চল ঠাকুর যেখানে আধুনিক যানবাহন প্রবেশ করে নাই। পদব্রজেই চলিতে হয়। যেখানে মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে, গো-ব্রাহ্মণে করুণা আছে।'

কমলাকান্ত বলিলেন, 'সে স্থান কোথায়? সেরূপ আদর্শ স্থান কি ভূ-ভারতে আছে।' বিড়াল কহিল, 'আছে ঠাকুর আছে। আছে শুধু নয়, আগামী শতবর্ষেও থাকিবে। নচেৎ আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিতে হইত।' কমলাকান্ত বলিলেন, 'জানা থাকিলে এরূপ গ্রামের নাম কর দেখি।' বিড়াল উত্তর করিল, শুনিতেছি প্রসন্ন ঠাকরুণ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাসীর গ্রামে যাইতেছে। তিনটি বাস পাল্টাইয়া, তাহার পর দশ মাইল হাঁটিয়া যাইতে হয়। সেখানে এখনও রেড়ির তেলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে। আমি একবার ঠাকরুণের সহিত গিয়াছিলাম। এখনও গন্ধ শুঁকিয়া যাইতে পারিব আশা রাখি। ঠাকুরাণ পেঁছাইবার পূর্বেও ঘাঁটি জমাইতে পারিলে মন্দ হয় না। তিনি আমাদের দেখিলে আহ্লাদিতই হইবেন।'

কমলাকান্ত বলিলেন, 'সংশয়ে ছিলাম। হে মার্জারি, তুমি আমায় বাস্তববুদ্ধি দান করিলে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি কি মনে কর আমার প্রতি প্রসন্নর এখনও ইয়ে ভাব আছে? বিড়াল কহিল, বিলক্ষণ ঠাকুর, বিলক্ষণ।' কমলাকান্ত বলিলেন, 'আশ্বস্ত হইলাম। তবে এস তোমায় আমার থলির মধ্যে ঢুকাইয়া লই। নচেৎ কেহ দেখিয়া ফেলিলে আমাদের যাত্রাভঙ্গ হইবে।' বিড়াল মেঁয়াও বলিয়া সম্মতি জানাইয়া কমলাকান্তের থলির ভিতর অদৃশ্য হইল। তাহারা দেশান্তরে চলিল।

গোপন প্রেম ইন্দু রক্ষিত

চোখের সাথে আলাপ চোখে
বুঝবে কে বা মানে
মনের কোণে গুঞ্জরে যা
শুনবে কে তা কানে।
(তব) কোমল পরশ উতল বায়ে
পাঠিও, কে বা জানবে তারে
আর
শ্যামল বনের ছায়া ঘিরে প্রকাশ দিও ঢেলে
(ঐ) ফুল্ল ফুলদলে কে বা চিনবে আঁখি মেলে।

গুপ্ত গান নিশিনাথ সেন

শুনি আচম্বিতে কী গর্জন!
মেঘ-দ্বিখণ্ডিত তড়িৎ-তীরে
প্রচণ্ড বাধাতে ভেঙেছে মন
কিঞ্চিত এগিয়ে এসেছি ফিরে।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভে ধূসর ধুলো
সাগরে উত্তাল জলের ফণা
প্রতীপ ঝাপ্টায় নিভ্ছে চুলো
হৃদয়ে বর্দ্ধিত কী যন্ত্রণা!

মাটিতে কম্পন বাসুকী-হাঁচে!
তোমার পূর্ণতা আগত দ্বারে,
বিধ্বস্ত গ্রাম শহর নাচে
হৃদয়ে শূন্যতা ক্রমশ বাড়ে।

চুলোর কন্দরে গুপ্ত গান
রচেছে আলোছায়া প্রতিটি দিন
আধির অতিরেকে মগ্নপ্রাণ
হিমশীতোজ্জ্বল কী মসৃণ !

বাংলা ভাষা ডাঃ নগেন নিয়োগী

হে মোর বাংলা ভাষা
তোমাকে ভালবাসি অপরিসীম
তোমার মধ্যে রয়েছে যে শক্তি অসীম।
তুমি সৃষ্টি করেছ বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম
রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র।
যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি
আর ভাবি কাল থেকে কালে
সৃষ্টি হবে আরও কল্পনাতীত স্বপ্ন
তোমাকে বরণ করি।
তাই যেন হয়। তোমাকে স্মরণ করি।

নিজস্ব লিপিকলা প্রিয়ব্রত গৌতম

ওগো, নীল-সবুজি প্রাণ !
নিজস্ব লিপিকলা, হারালো কোথায় ?
আমি কল্পনালতা আঁকি।

আমি মহাজাগতিক মেঘে ভেসে যাই
এক ডানা, দুই ডানা ;
সৌরদেশের সীমানা পার হয়ে
এক ডানা, দুই ডানা।

সোনার পদ্ম ফোটাও তুমি
লোহার ঘোড়া ছোটাও
তোমায় দেখে সলজ্জে
উল্কার দাগ ঢাকি।

ওগো, নীল-সবুজি প্রাণ !
নিজস্ব লিপিকলা, হারালো কোথায় ?
আমি কল্পনালতা আঁকি।

রুটি ফজলুর রহমান 'হাশমী'

অনুবাদ : কালিপদ কোঙার

রুটি
অদ্ভুত বস্তু
সে ভদ্রলোককেও
ভদ্রতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে
আর গান্ধারীকে
পুত্রদের মৃতদেহের উপর দিয়ে
হাঁটতে বাধ্য করছে।

আমি দেবকুমার গুহ

পথ বেধে দাও নিভে যাক্ সব
আঁধারের যত গ্রন্থী
নিমেষ হারাক সুদূরে মিলাক
মহামিলনের যন্ত্রী
নিজেকে হারাই স্বপ্নের থেকে
স্বপ্নের যত বেশে

বাঁধন ছিঁড়েছে ততই আজিকে
দিগন্তের দেশে দেশে।
সুদূর অদূর সীমাহীন তাই
সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে
পেয়েছি যে খুঁজে চোখখানি বুজে
আমার আমিকে হারিয়ে
বন্ধন আজি বন্ধন নয়
বন্ধন মহা নন্দন
হাস্য তাই ভাষ্য হোল
ক্রন্দন ফেলি বন্ধন।
মুক্তির তাই মহাদ্বারে এসে
হারানু আমার পথ
পথখানি মত যত পাই তত
থামে নাতো মোর রথ,
শূন্যের থেকে শূন্যের বুকে
ক্লান্ত আমি যে আজ
আমার আমিকে পাব যবে আমি
থামবে আমার কাজ।

কেন এ পক্ষপাত ?

হরি ভট্ট

অনলে, সলিলে, ধরা, নভনীলে
তুমি যদি আছো হায়,
কেন ফুল না ফুটিতে এই ধরণীতে
শুধু শুধু ঝরে যায় ?

যদি সব কিছুতেই তোমার প্রকাশ,
সব কিছুতেই আছো,
তবে দুখের উপরে আরো দুখ দিয়ে,
আনন্দে কেন নাচো ?

তোমাকে পাইতে যাহারা মরিল
ধরা নাহি দাও তারে
প্রেম বরিষণ শিরে দাও ঢেলে—
নাস্তিক ও কুলাঙ্গারে ?

মনের প্রদীপ নিভালে যাহার,
নিভালে চোখের আলো,
তোমারই পাষাণে মাথা কুটে তারা
মরিল বাসিয়া ভালো।

প্রাচুর্য আর প্রলোভন দিয়া,
যাহারা করিল জয়,
শুধু অশ্রুজলের সম্বল যার
তুমি কি তাদের নয় ?

তুমি যদি হও জগদীশ্বর,
কেন এ পক্ষপাত ?
নেতাদের মত তুমিও কি চাও
করিতে কিস্তিমাৎ ?

কোন্ ভাষাতে মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

কোন্ ভাষাতে আমি আমার
ডাকছি মাকে, মা
কোন্ সে ভাষায় কথা বলেন
পড়শী কাকীমা।

কোন্ ভাষাতে আমার ছেলে
আমায় ডেকে যায়,
কোন্ সে ভাষায় আমার মেয়ে
মিষ্টি সুরে গায়।

কোন্ ভাষাতে খোকনমণি
নিত্য শিখে পড়া,
কোন্ সে ভাষার মাধুরিমা
হৃদয় আকুল করা ;
কোন্ সে ভাষা ভাই
সেই সে ভাষা বাংলা ভাষা
ছড়ায় যে রোশ্‌নাই,
সেই সে ভাষায় আমি
এইটুকুনি ছড়া লিখে
এখানটাতেই থামি।

ভয় হয় রণজিৎ মিত্র

মানুষের কাছাকাছি আমিত আসিনি কখনও
মানুষের দুঃখ-জ্বালা নিয়ে
চক্রবাক পরিধিতে নিত্যকার যন্ত্রণা বুকে
বাস্তব জীবনে তার অংশীদার হতে
আমার ত' নেই কোনো ঠাঁই।

তবু কেন কবিতার পাণ্ডুলিপি ঘিরে
মানুষের দুঃখ-জ্বালার মেকী ইতিহাস
ঠাঁই পায় পাতায় পাতায়।

জীবনের মাটি বড় শক্ত জেনে তাই
জীবনের মুখোমুখী হতে এ' কবির
ভয় হয়, ব্যক্ত যদি হয়।

মুক্তকেশী ইরা চক্রবর্তী

হে বৃহস্পতি, বলো মোরে,
এখনো কি আছে
মৃতসঞ্জীবনী সুধা তব বক্ষমাঝে ?
কি পাপে হানিলা বিধি এ কঠিন আঘাত
তোমা 'পরে ?
কারে বা বাঁচাতে টেনে নিলে
ধূমকেতুর ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিরে নিজবক্ষ 'পরে,
দধিচীর মত।
কেন বা সে কঠিন আঘাত ?
কোন প্রতিশোধ নিতে
বিদীর্ণ করিল এবে তোমার হৃদয়।
কেন তব বক্ষের শোণিত ছড়ায়ে পড়িল
দিকে দিকে উল্কারূপ ধরি ব্রহ্মাণ্ডের পথে ?

অথবা—
ধূমকেতু বুঝি কোন মুক্তকেশী নারী,
তোমা হেরি ভুলেছিল নিজ কক্ষপথ।
রাধা সম মিলাইল প্রিয়-হিয়া মাঝে
আপনার ভালবাসা করিতে সার্থক।
তাই বুঝি আনন্দের হাসি আর আলো
উল্কা হয়ে দিকে দিকে ছড়ায়ে পড়িল।

শুধু একবার জয়ন্ত বসু

বসন্ত,
কামনা কোর
যেন শেষের শুরুর আগে,
একবার,
তোমার দ্বারে যেতে পারি,
শুধু একবার—
তোমার দরজার সামনে, মাটির পথে
পড়ে থাক কাঁকর অজস্র,
প্রয়োজন নেই গোলাপ-সুবাস!
তুমি ব্যস্ত থেকো, অন্য কোন কাজে
অন্য কিছুর মাঝে—
শুধু একবার,
খোলা জানালার সরলরেখায়
দৃষ্টি ফেলো,
শুধু একবার,
দূর থেকে, তোমার ঐ তন্বী দেহমোমে
আগুন জ্বেলে,
উত্তাপ দিতে এই—
ক্লান্ত শীতল শরীরময়—
শুধু একবার,
দয়া কোর বসন্ত,
শুধু একবার।

ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা বিশ্বনাথ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ কৃপালণী অভিযোগ করেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখা কুইন ভিক্টোরিয়ার চিঠিগুলি অগ্নিগর্ভে দান করে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করে গেছেন। কিন্তু মহারাণীর দেওয়া অঙ্গুলি সমান সুবর্ণের চোদ্দ ফুট মফচেনটি ভাগ করে নিতে ভুল করেন নি। আমিও তাঁর পরিবারের একজন বলে তাঁর এই ভুলের সমালোচনা করতে পারি।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের পদস্পর্শ করে ভারতীয় সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। দেখা যায় দ্বারকানাথের চরিত্রে মানসিক বলিষ্ঠতা ছিল, শিল্প সংগঠন চিন্তা ছিল, রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল। কোনও রকম অভিজ্ঞতা অর্জনে অনীহা ছিল না, কোন বিলাসিতায় অনিচ্ছা ছিল না, সর্বোপরি ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্রে নানা কৌশল প্রয়োগের অপূর্ব জ্ঞান ও দক্ষতা।

তাই জয়রাম কুশারী এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঠাকুরদা—পঞ্চানন কুশারীদের কথা বাদ দিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাঁচ পুরুষের কাহিনী বলতে চাই। যেখানে পাওয়া যায় আধুনিক ভারতবর্ষের তথা বিশ্ব ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য ও মূল্যবান সংক্ষিপ্তসার।

দ্বারকানাথ সৌন্দর্যের পূজারী হলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র কঠিন বাস্তবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে তিনি ছিলেন নির্মম ব্যবসায়ী। তিনি জমিদারীর পর জমিদারী কিনে রেশম ও নীলের চাষ করেছেন। আমলাতন্ত্রকে বোঝবার জন্য সরকারী চাকুরী করেছেন। রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলি একের পর এক দখল করেছেন। 'কার টেগোর কম্পানির" প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি চালু হয়েছে। বেলগেছিয়া

ত্রিলা তৈরী হয়েছে। শুধু বিলাসিতার জন্যই নয়, ক্ষমতাশালী ইংরেজদের পাকড়াও করবার জন্য। তারপর ঐ বিলাসী মানুষটি চলেছেন ইংলণ্ড।

দ্বারকানাথ দুবার ইওরোপ গিয়েছিলেন। সুয়েজ থেকে স্থলপথে মরুভূমি পার হয়ে কায়রো দিয়ে ১৮৪২ সালে। আর দ্বিতীয়বার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৪৫ সালে। শোনা যায় তিনি কুইন ভিক্টোরিয়ার অন্দরমহলেও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর মাত্র ৫২ বছরের জীবনের হঠাৎ সমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট লণ্ডনে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর অপৌত্তলিক প্রথায় শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন এবং রামমোহনের প্রভাবে আগেই নিরাকারবাদী হয়ে ঈশ্বরের সাধনা শুরু করেছিলেন। ফলে সাধারণের থেকে তাঁকে অনেকবার আঘাত পেতে হয়েছিল এবং তিনি নির্ভীক বিপ্লবীর মতই সে আঘাত গ্রহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে ধর্ম-সাধনার নবীন সঙ্গী কেশবচন্দ্রের সুবিধাবাদী পথ গ্রহণে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন নি। দেবেন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন ৮৮ বৎসর।

আমরা দেখতে পাই শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের পর রামমোহনই ভারতীয় ধর্মচেতনাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে গেছেন। যে আন্দোলন থেকে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পেয়েছি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ইত্যাদিকে।

আর তৃতীয় পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছেন শুধু ভারতবর্ষকেই নয় সমগ্র এশিয়াকে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশাল বটবৃক্ষের আড়ালে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন চতুর্থ পুরুষে। তবুও তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি নান্দানিক চর্চা ও ইংরেজ বিতাড়নের বহু চেষ্টা

ইতিহাসের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি। জীবিত ছিলেন—সুধীন্দ্রনাথ ৬০ বছর। বলেন্দ্রনাথ ২৯ বছর আর সুরেন্দ্রনাথ ৬৮ বছর।

১৮১৮ সালে জার্মানীতে জন্মেছিলেন কার্ল মার্কস। তাঁর ৬৫ বছরের জীবনে প্রাচীন ও নবীন ধর্মগুলির বেড়াজাল ভেঙ্গে মানুষকে মুক্ত করবার অসামান্য চেষ্টা তিনি করেছিলেন। সে চিন্তার ঝড় প্রবল বেগে এসে আছড়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীর বুকে। এর কেন্দ্রবিন্দু জার্মানী হলেও তার প্রয়োগভূমি ইওরোপ না হয়ে, হল রাশিয়া। আর এই ঘূর্ণির মধ্যেই পাওয়া গেল ঠাকুরবাড়ির পঞ্চম পুরুষকে। তিনি জোড়াসাঁকো থেকে কলম্বো হয়ে সুয়েজ দিয়ে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে জুন মাসের এক রৌদ্র ঝলমল সকালে ট্রেনে করে পৌঁছলেন মস্কোর বিরাট ষ্টেশনে। নামলেন পঞ্চম পুরুষ, নাম তখন তাঁর স্পেনসর। আবার ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে নাম হল—'কমরেড নারায়ণ।' মস্কোর ডেস্কে রাখা হয়েছে ১৯২৭ সালের ভারতীয় সেণ্ট্রাল কমিটির নামের তালিকা। তাতে আছে—আমি, ডাঙ্গে, শৌকত ওসমানী, মুজাফর আহমেদ, ঘাটে আরও দু-একজন।

মীরাট কনস্পিরেসি কেস শুরু হওয়ায় ভারতবর্ষে ফিরতে বারন করা হল তাঁকে। কারণ কেসের মধ্যে বলা হয়েছে—এম. এন. রায় আর তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

এই সময় হিটলার তাঁকে বন্দী করেছিল মিউনিক জেলে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মস্কো গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। ফিরে আসেন কলকাতায় ১৯৩৪ সালের ১৪ই আগষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। যে রক্ত কমলটির সন্ধানে ইতিহাস ব্যস্ত ছিল এতদিন, তার দেখা পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, কমরেড সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলে বন্দী হলেন। তারপর বারবার জেল-জীবন ভোগ এবং জেল বদল করতে করতে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে আবার ১৯৩৭ সালে কিছুদিন দার্জিলিং জেলে বন্দী থাকেন। ১৯৭৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সৌম্যেন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে ৭৩ বৎসর বয়সে।

এই ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকটি প্রতিভা জাতে রোম্যাণ্টিক, স্বভাবে বিপ্লবী এবং আচরণে অনমনীয়। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তৃতীয় পুরুষ। তবু ইতিহাসের পূর্ণতার জন্য দরকার হয়েছিল একটি রক্তকমল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশবিদেশের মানুষ সচেতন হলেও আরও সচেতনতার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদেশে না হলেও স্বদেশে যথেষ্ট পরিচিত। প্রথম ও পঞ্চম পুরুষ নান্দনিক বেড়া জাল ভেঙ্গে কঠিন বাস্তবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বিদেশের থেকে স্বদেশে কম পরিচিত।

এই হচ্ছে পাঁচ পুরুষের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ১৭৯৪ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীকালের ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস বাণিজ্য, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, সাম্যবাদী দর্শন ও বিপ্লবী আন্দোলনে ভরা। ভারতবর্ষের দুই শতাব্দীর ইতিহাস যেন সংক্ষেপে রূপ নিয়েছে এখানে।

আনন্দই ভগবান ধীরা ভট্টাচার্য

হে চির সত্য, চির সুন্দর, শাশ্বত, অমূর্ত্ত, শান্তিদায়ক, কল্যাণকারী উপলব্ধ আনন্দ, আমার হৃদয়ে তোমার নিত্য উপস্থিতি হোক। ভগবান আনন্দময়। আনন্দের অনুভূতি, ভগবানের উপস্থিতি। ভগবান ষড়গুণান্বিত। হে আনন্দ, তোমারও অপার গুণ। তুমি সমগ্র ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে ঐশ্বর্য ছড়ান

রয়েছে, সুখানুভূতির যা আনন্দ তা তুমি। হে আনন্দ, তোমার অসীম বীর্য দ্বারা তুমি সকল হতাশা অসাফল্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আশার আলোকে মনে আনন্দের দীপ জ্বালিয়ে রাখ। জীবন যখন ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন তুমি অন্তরস্থিত আনন্দালোকে জীবনকে আবার নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলো। জ্ঞান প্রকাশ-স্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে আমার বদ্ধ হৃদয়ের অন্ধকার যখন দূর হয়ে যখন আলোর বন্যা বয়ে যায় তখন হে আনন্দ, আমি তোমায় উপলব্ধি করি।

হে আনন্দ, তুমি শ্রীমণ্ডিত। তোমার শুচিতা তোমাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। আনন্দ উপলব্ধির যে অসীম সরসতা তা তোমার ঐ গুণের দ্বারাই বোধ হয়। ভগবানের মাধুর্য আনন্দের মধুরতা। হে মাধুর্যময় আনন্দ-স্বরূপ ভগবান, তোমার মাধুর্যকে আমি আনন্দ থেকে পৃথক করতে পারি না। হে প্রেমময়, তোমার প্রেম তোমাকে মাধুর্য দিয়েছে। আমার প্রেম আমাকে আনন্দসাগরের অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। ভালবাসায় ভক্তিসিঞ্চিত হয়েছে, প্রেমে আনন্দ প্লাবিত হয়েছে। তাই প্রেমের আনন্দ অপার, সীমাহীন, গভীর হতে গভীরতর। কিন্তু হে আনন্দ, তোমাকে গভীরতম ভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাকে যে আরও একধাপ এগোতে হবে। বৈরাগ্য-সাধনের সাধক না হলে তোমাকে পূর্ণ করে কেমন করে পাব? সৃষ্টিতে গভীর আনন্দ, স্থিতিতে আনন্দ গভীরতর, লয়েতে আনন্দ গভীরতম। এ তমের প্রকাশ হয় না। ব্যাখ্যা হয় না। এ আনন্দে বিলীন হয়ে যেতে হয়। তাই হে আনন্দ, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা আমাকে কখনও ছেড়ে যেও না। তুমি আমাতে স্থিত হও, আমি তোমাতে লীন হই।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ সংকলন—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সাহিত্যবাণী প্রকাশনী, ২৬।১, কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া—২

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা।

প্রয়াত সাহিত্য-সমালোচক বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৯৪—১৯৮২) মহোদয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে চোদ্দটি প্রবন্ধের এক সুন্দর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ছোট ছোট প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য, শিক্ষা, সঙ্গীত, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত ভাষায় নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই মোটামুটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। সমন্বয়ের সাধনা, সাধক সান্নিধ্যে, মহামানবের সাগর তীরে, সহকর্মী ও সহমর্মী, বৈদগ্ধ বৈচিত্র্য, ভেদাভেদ দর্শন, মত আর পথ ইত্যাদি।

লেখক বিজয়চন্দ্রের ভাষার একটু নমুনা দিচ্ছি।

'বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ভারতের ধর্ম।...এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য প্রমুখ মধ্যযুগের সাধকেরা সমন্বয়ের বাণী প্রচার এবং বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।...একমাত্র সাহিত্যই সমাজকে দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পারে এবং সৎ-সাহিত্যই সদ্ভাবের পরিপোষক। সাহিত্যালোচনার ফলে লোকে দুঃখ দৈন্য ভুলিতে ও অবসাদ ত্যাগ করিতে পারে, ঘৃণা-বিদ্বেষের পরিবর্তে মানব-প্রীতির সঞ্চার হয় যাহা জাতীয় সংহতি সাধনের অনুকূল।'

এই বইয়ের ভূমিকায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '—এ কালের পাঠক তাঁর নাতিক্ষুদ্র আলোচনা থেকে নতুন ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিচার করার সুযোগ পাবেন।'

এই নির্বাচিত প্রবন্ধগুলো প্রকাশ না করলে পত্রপত্রিকার চাপে হারিয়ে যেত। এজন্য এই বইটি প্রকাশ করে উদ্যোগীরা একটি ভাল কাজ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রীতিমাধব গুপ্ত

উদ্ধৃতি

শ্রীচৈতন্য ও রবীন্দ্রনাথ

আজকাল যে একটি মাত্র কথা বাঙলাদেশের প্রত্যেক লোকের মনে আন্দোলিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে নানা রকম জনমত, কখনও খবরের কাগজের পাতায়, কখনও মুখে-মুখে, নানা তর্কে যুক্তিতে কখনও বা যুক্তিহীন আবেগে নানা রূপ ধারণ করেছে। এই রকমই এক আবেগ-উচ্ছ্বাসে এক ভদ্রলোক বললেন, এদেশে হিন্দুজাতির মহা-অনিষ্টকারী রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীচৈতন্য—কেবল প্রেম আর কবিত্ব, গান আর সুর! সৌন্দর্যকলার মহড়া দিতে দিতে বাঙালির ছেলে আর হাতিয়ার ধরতে পারে না, ইত্যাদি—এঁদের রায় শুনে মনে হল শ্রীচৈতন্য ও রবীন্দ্রনাথের উচিত ছিল সমস্ত দেশটাকে ছুরিতে শান দিতে শিক্ষা দেওয়া।

মৈত্রেয়ী দেবী। জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ (জুন ১৯৪৭)

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলিম সম্প্রদায়

১৯৩৮ সনে বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকীর সময়েও মওলানা আকরম খাঁ-দের নেতৃত্বে মহাসমারোহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব। বাজার থেকে সব আনন্দমঠ কিনে এনে বিরাট উৎসবের আয়োজন করে সেদিন সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই সেদিন সেসব ঘটনার প্রতিবাদও হয়েছিল। বহ্নিউৎসবের পরে রেজাউল করিম লিখেছিলেন ঃ

বহুযুগ পর্যন্ত মুসলমান-সমাজ গভীর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিবে। বহু যুগ পরে হয়তো এই মোহাচ্ছন্ন সমাজের চেতনা সঞ্চার হইবে। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের যে ক্ষতিটা হইতেছে, মানসিকতার যে দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অতীব শোচনীয় এবং কতক কতক ক্ষেত্রে একেবারেই অপূরণীয়।

দৃশ্যত মনে হইল 'আনন্দমঠ' ভস্মীভূত হইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি। ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের আত্মসম্মান ও সুমহান মহিমার স্পর্ধিত আসন।—আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলাদেশ।

শুধু বাঙালি পাঠক এবং বাংলাদেশ

শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার পক্ষ থেকে প্রসূন বসু বলেন, গত ৭ জুন সভার সাধারণ পরিষদের বৈঠকে দোকান-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার নিজেরাই পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতারা যে সমস্যায় পড়েছেন তার সমাধান না করে বেতন-কাঠামোর বিষয়টি সামনে আনা অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলে সভা মনে করেছে।

প্রসূনবাবু বলেন, কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের ব্যবসার ৮০ শতাংশই পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার ধাপে ধাপে মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিজেরাই হাতে নেওয়ায় ছোট-বড় মিলিয়ে ২৫টি প্রকাশনা সংস্থা উঠে গিয়েছে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য সাহিত্যের বই কিনলেও এক বছরের আগে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় না। শুধু বাঙালিপাঠক এবং বাংলাদেশে বই রফতানি করে সাহিত্যগ্রন্থের প্রকাশকেরা কোনওমতে টিকে আছেন।

আনন্দবাজার ১১।৬।৯৪

তসলিমা নাসরিন

বারাসত, ৯ জুলাই (আই এন এ) ঃ তসলিমা নাসরিন-সহ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর বাংলাদেশ সরকার ও মৌলবাদি শক্তির যৌথ আক্রমণের প্রতিবাদে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতি সংসদ বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট শনিবার সন্ধ্যায় এক

প্রতিবাদ সভা করে। এই সভা থেকে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি করে বক্তব্য রাখেন দুলাল মুখার্জি। অধ্যাপক সুধীন চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষাতে ঢুকিয়ে ভাষার চেহারা পালটাবার যে প্রয়াস বাংলাদেশে চলেছে তসলিমা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। নীলিমা সমাদ্দার বলেন, তসলিমা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন তাঁর অসাধারণ উক্তির জন্য—'ডিম নষ্ট হয়, আর নষ্ট হয় নারী। আর নষ্ট সমাজ নষ্ট নারীকে ভোগ করার জন্য ওৎ পেতে থাকে।' এই সত্য উক্তির জন্য তাঁর জীবন আজ বিপন্ন। সভাপতিত্ব করেন হিরণ্ময় সেন।

—দৈনিক ওভারল্যাণ্ড, ১০।৭।৯৪

যুগোশ্লাভিয়ায় বাংলা গান

বিভক্তপ্রায় যুগোশ্লাভিয়ায় শান্তি স্থাপনের সংগ্রামে হরেকৃষ্ণ ভক্তদের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার অভিযান আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করছে। গ্রন্থপ্রচার, শান্তিসমাবেশ, হরিনাম সংকীর্তন, যুদ্ধবিরোধী ভাগবত প্রবচন, কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা, ভারত উৎসব —এইগুলিই এখনকার জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম।

সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ায়—ইউরোপের বিভিন্ন সংগীত গোষ্ঠীর মতো নিত্যানন্দ ভজন ব্যাণ্ড' গড়ে তুলেছে কৃষ্ণভক্তরা। পদাবলীর 'নিতাইয়ের করুণা হলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে' ভক্তিগীতির বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী মায়া তাকাচ্চা বলেন,—'নিত্যানন্দ ভজন ব্যাণ্ড' যুগোশ্লাভিয়া জুড়ে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের করুণা বিতরণ করছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর অমর সঙ্গীত গেয়ে। ইউরোপীয়দের কাছে ভারতের বৈষ্ণব কবিদের রচিত এই সমস্ত ভজন খুবই সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে।—

—পাক্ষিক হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার বর্ষ ১৭, সংখ্যা—৪

যে যেখানেই থাকো

তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন' সেখানেই আমাদের মাতৃভাষার বিস্তার ঘটিয়ে যাও, তোমাদের হৃদয়ের অন্তরে সর্বক্ষণ ধ্বনিত হোক কবিগুরুর সেই গান—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' —সম্পাদকীয়, অতলান্তিক, প্রভাতকুমার দত্ত স্মরণ সংখ্যা মার্চ, ১৯৯৪

বিশ্বজয়ী

—হাজার হাজার কিশোরী কুমারী মা, পথে-ঘাটে ড্রাগ খেয়ে পড়ে রয়েছে ছেলেমেয়েরা—ভয়ংকর এক শ্রদ্ধাহীনতায় জর্জরিত এদেশের মানুষ। এখানকার ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করে না। এসব দেখে রীতিমত শিউরে উঠেছি আমি। আমাদের দারিদ্র্য সমস্যা এর কাছে কিছুই নয়।—

—সুস্মিতা সেন। সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৩।৭।৯৪

আর্ট কলেজ ছাত্রদের মিছিল

শিল্পীবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীগণকে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী শুক্রবার বিকেলে এস্‌প্লানেড ইস্টে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের দ্বারা কলেজের পুকুর ও সংলগ্ন জমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে একটি মিছিল করেন। পরে তাঁদের মধ্যে থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে তাঁদের দাবী সনদ পেশ করেন। —স্টেটসম্যান, ৬।৮।৯৪ শনিবার

সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ

৭ মে ১৯৯৪ শনিবার সন্ধ্যায় হাতে লেখা বার্ষিক পত্রিকা 'পদ্ম'র ৩২তম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে হাজরা রোডে 'বর্ষবরণ-রবীন্দ্রস্মরণ' উৎসব অনুষ্ঠিত হল। গীতিআলেখ্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

শিশু শিল্পীদের উৎসাহই ছিল বেশি। তাদের মধ্যে পিয়া, অরিত্র, অঙ্গনা, শ্রুতিরূপা, ঈশানী, অঙ্কিতা, অরিজিৎ, সপ্তর্ষি, আরণ্যক—নাচে, গানে, আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেছে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন স্বরূপ পাল, নৃত্য পরিচালনায় চিত্রা ভট্টাচার্য। তবলা সঙ্গতে সনৎ চক্রবর্তী ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক বাধন দাশ, তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের চমৎকারিত্বে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সম্পাদক, গৃহবধূ, গৃহিণী অনেকেই রাত দশটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি সানন্দে উপভোগ করেছেন। আমেরিকার রাইস্‌ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের ভিডিও তোলায় উদ্যোক্তারা অধিক উৎসাহিত হন।

৩০ মে ১৯৯৪ সোমবার পূর্ণদাস রোড বালিগঞ্জে সন্ধ্যায় 'অনুরাগ' দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশের উপলক্ষে একটি, মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিষ্ণুলাল দাশগুপ্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপালী চৌধুরী ও মীনা বসু। চারটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন সুধা চট্টোপাধ্যায়, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরা ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ ঘোষ, দেবাশিস গুহ, অর্চিতা রায়চৌধুরী, দেবকুমার গুহ এবং প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বাংলা ভাষার স্বাধিকার রক্ষায় এবং বঙ্গ সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের জন্য 'বঙ্গ ভাষা সংস্কৃতি প্রসার সমিতি'র পক্ষে ২৬.৬.৯৪ তারিখে বিকেলে সিধু কানু ডহরে এক সমাবেশের আয়োজন হয়। সভায় আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, আজিজুল হক, শৈবাল মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

১ জুলাই থেকে তিনদিন আমেরিকার শিকাগো শহরে চতুর্দশ বঙ্গ সম্মেলন হয়ে গেল। রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থশংকর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, অনুপ ঘোষাল, অমর পাল, অমিতা দত্ত (কত্থক), মুনমুন সেন প্রমুখ অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন।

৯।৭।৯৪ তারিখে 'অনুরাগ প্রকাশন' দপ্তরে 'অনুরাগ' সাহিত্য বাসরের মাসিক অধিবেশন হয়। বরুণ চক্রবর্তী, সুকুমার ভট্টাচার্য, সুধা চট্টোপাধ্যায়, বিমলকুমার ভট্টাচার্য কবিতা পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন ধীরা ভট্টাচার্য, জয়ন্তী সান্যাল ও ইরা চক্রবর্তী। গল্প পড়ে শোনান অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পাঠ করেন অর্চিতা রায়চৌধুরী। একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন অনুরাগের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

টুকরো খবর ॥ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বেহালা শাখার নিয়মিত সভা হয় প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে বেহালায় ২ সত্যেন রায় রোডে। দক্ষিণ কলিকাতা শাখার সাপ্তাহিক সভা হয় প্রতি বৃহস্পতিবারে শরৎ স্মৃতি মন্দিরে ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা ২৯। এ বছর কলকাতা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ শুদ্ধসত্ব বসু।

'একক' কবিতা ত্রৈমাসিকের সভা হয় প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সকাল দশটায় একক পত্রিকা দপ্তরে ১০।৩।সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলকাতা-২৬ ঠিকানায়।

'সাহিত্যিকা' নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন বসে 'অনুকূল ভবন' ১৬১/২/১, রাসবিহারী এভেনিউ কলকাতা-১৯, প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

৯ ও ১০ জুলাই উদয়ভানুর ছবির প্রদর্শনী হয় ফ্ল্যাট ওয়াই-৩৩ শিবনাথ ভবন—সি. এল. টি ও চাকুরিয়া ব্রীজের পাশে। প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে গান কবিতা ও আড্ডা জমে উঠেছিল।

১১ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবির বাড়িতে ১৪ ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৩১ কবিতা গান আলোচনার আসর বসে।

২৯ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বিড়লা অ্যাকাডেমি মঞ্চে 'আর্চিক' নিবেদিত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান করেন অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, মালাশ্রী গোস্বামী, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ পাল। নাট্যপাঠে অংশগ্রহণ করেন ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে স্বাগতা ঘোষ, গানে সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাতী ঘোষ। ভজন পরিবেশন করেন ধীরা ভট্টাচার্য। আবৃত্তিতে সনৎ চক্রবর্তী। নজরুলগীতি শোনান গোপা পাল। যন্ত্রে সহযোগিতা করেন অরবিন্দ প্রধান, সুবীর চৌধুরী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাখন মজুমদার।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বরূপ পাল। বৃষ্টির জন্যে আশানুরূপ শ্রোতা উপস্থিত হতে না পারলেও উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাব ছিল না। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন মুখোপাধ্যায়, অমর দে ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমীরবরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির পরিবর্তিত নাম হয়েছে 'বাংলা ভাষা'। এই নামেই পত্রিকাটি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। পূর্বের নাম ছিল—'আ মরি বাংলা ভাষা'। ১৪০১ শ্রাবণ থেকে নতুন নাম হয়েছে।

★